মিয়ানমার ধর্মের কাহিনি শোনার পাত্র নয়

ইশফাক ইলাহী চৌধুরী

প্রতিবেশী

কূটনৈতিক হুঁশিয়ারির পাশাপাশি বাংলাদেশের সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী সীমান্তের ভেতরে থেকেই 'সামরিক প্রতিক্রিয়া' প্রদর্শন করতে পারে। বিমানবাহিনী যেমন যুদ্ধবিমান দিয়ে সীমান্ত এলাকা প্রদক্ষিণ করতে পারে, তেমনি নৌবাহিনীও যুদ্ধজাহাজ নিয়ে নাফ নদ বা সেন্টমার্টিন দ্বীপের আশপাশে টহল দিতে পারে। তাতে মিয়ানমারের কাছে একটা বার্তা যাবে– বাংলাদেশ বিষয়টি ভালোভাবে নিচ্ছে না। সতর্ক না হলে এর পরিণতি ভালো হবে না। তার মানে এই নয় যে, আমরা অস্থিতিশীলতা চাইছি। বরং আমরা যে হাত-পা গুটিয়ে বসে নেই– সেটা তাদের বোঝানো দরকার।

সতর্ক করার ৭ দিনের মাথায় আবারও যেভাবে বাংলাদেশ সীমান্তের অভ্যন্তরে মিয়ানমারের মর্টার শেল এসে পড়েছে এবং সেনা হেলিকপ্টারের আকাশসীমা লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে, তা নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। ইতোমধ্যে আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকেও সরকারের উদ্বেগের বিষয়টি ঢাকায় মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূতকে তলব করে জানানো হয়েছে। প্রথমবার দুঃখ প্রকাশের পর মিয়ানমার যদি সতর্ক থাকত, তাতে সমস্যা ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয়বার কেন ঘটল?

আমরা জানি, বাংলাদেশ সীমান্তসংলগ্ন রাখাইন রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনের জন্য অনেক দিন ধরে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে আরাকান আর্মি। এ লক্ষ্যে সশস্ত্র সংগ্রামও শুরু করেছে তারা। বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে আরাকান আর্মি অস্ত্র ও অন্যান্য দিক থেকে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এ জন্য মিয়ানমারের সেনাবাহিনী প্রায় নিয়মিত বিরতিতে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে। গত দুই-তিন সপ্তাহ ধরে রাখাইন রাজ্যে অভিযান ও পাল্টা হামলা চলছে। এই সংঘর্ষের জেরেই বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় মর্টার শেল বা গুলি পড়ছে। আমার ধারণা, শুধু মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর ব্যবহৃত গোলা-বারুদই নয়; ক্রমে শক্তিশালী হয়ে ওঠা আরাকান আর্মির গোলাও পড়তে পারে। তবে কারণ যা-ই হোক, বাংলাদেশ সীমান্তে এ ধরনের পরিস্থিতির দায় মিয়ানমার সরকারেরই।

প্রশ্ন হচ্ছে– বাংলাদেশকে উস্কানি দেওয়ার জন্য মিয়ানমার কি ইচ্ছাকৃত আমাদের সীমান্তের অভ্যন্তরে এভাবে গোলা ছুড়ছে? আমার মনে হয় না। কারণ রাখাইন রাজ্যে যে আরাকান আর্মির সঙ্গে সংঘর্ষ চলছে; সেটা স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে স্পষ্ট। কিন্তু কথা হচ্ছে, ইচ্ছাকৃত না হলেও আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ সংঘাতের জের ধরে গোলা-বারুদ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ফেলা যাবে না।

এখন, বারবার সতর্ক করার পরও যখন মিয়ানমার সতর্ক হচ্ছে না, তখন আমরা কী করতে পারি? আমি মনে করি, কূটনৈতিক হুঁশিয়ারির পাশাপাশি সামরিকভাবেও সীমান্তে সতর্কতা ও নজরদারি বাড়াতে হবে। দীর্ঘ মেয়াদে ওই সীমান্তে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবির উপস্থিতি আরও শক্তিশালী করতে হবে। ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ বিবেচনায় এমনিতেও ওই অঞ্চলে আমাদের সামরিক অবস্থান শক্তিশালী করা দরকার।

একই সঙ্গে আমি বলব– কূটনৈতিক হুঁশিয়ারির পাশাপাশি বাংলাদেশের সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী সীমান্তের ভেতরে থেকেই 'সামরিক প্রতিক্রিয়া' প্রদর্শন করতে পারে। বিমানবাহিনী যেমন যুদ্ধবিমান দিয়ে সীমান্ত এলাকা প্রদক্ষিণ করতে পারে, তেমনি নৌবাহিনীও যুদ্ধজাহাজ নিয়ে নাফ নদ বা সেন্টমার্টিন দ্বীপের আশপাশে টহল দিতে পারে। তাতে মিয়ানমারের কাছে একটা বার্তা যাবে– বাংলাদেশ বিষয়টি ভালোভাবে নিচ্ছে না। সতর্ক না হলে এর পরিণতি ভালো হবে না। তার মানে এই নয় যে, আমরা অস্থিতিশীলতা চাইছি। বরং আমরা যে হাত-পা গুটিয়ে বসে নেই– সেটা তাদের বোঝানো দরকার।

অবশ্য সীমান্ত এলাকায় মিয়ানমারের সাম্প্রতিক আচরণের বিপরীতে আমাদের যেমন কড়া প্রতিক্রিয়া দেখাতে হবে; তেমনি সংযম প্রদর্শনও জরুরি। কারণ রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশ যদি মিয়ানমারের সঙ্গে সামরিক দিক থেকে মুখোমুখি দাঁড়ায়, তাহলে তারা একটি খোঁড়া অজুহাত দাঁড় করানোর সুযোগ পেতে পারে। সামরিক উত্তেজনার ইস্যু ব্যবহার করে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন থেকে দৃষ্টি সরিয়ে দিতে পারে। সে জন্য মিয়ানমারের এসব আচরণে বাংলাদেশের সহিষ্ণু প্রতিক্রিয়াই যথার্থ।

বলার অপেক্ষা রাখে না, প্রায় সব দিকেই মিয়ানমার সীমান্ত অস্থিতিশীল। কারণ, মিয়ানমারের ভেতরে বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন সক্রিয়। বিশেষ করে মিয়ানমারের সংখ্যালঘু নানা গোষ্ঠী যেভাবে নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার; সে কারণেই তাদের মধ্যে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে। সে জন্যই আমরা দেখছি, শুধু বাংলাদেশ সীমান্তে গোলাবর্ষণ বা আমাদের আকাশসীমা লঙ্ঘনই নয়; মিয়ানমার-সীমান্তবর্তী চীন ও থাইল্যান্ডের সঙ্গে একই ঘটনা ঘটেছে। বাংলাদেশেও এর আগে ২০১৭ ও '১৮ সালে আকাশসীমা লঙ্ঘন করে

মিয়ানমার।

আমাদের মনে আছে, ২০১৫ সালে মিয়ানমারের যুদ্ধবিমান চীনে ঢুকে পড়লে চারজন কৃষক নিহত হয়। সে ঘটনায় চীন ব্যাপক প্রতিবাদ জানানোর পরিপ্রেক্ষিতে মিয়ানমার চীনের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে। মিয়ানমার সবচেয়ে বেশি আকাশসীমা লঙ্ঘন করে থাইল্যান্ডের। কারণ মিয়ানমারের কারেন সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর কারেন ন্যাশনাল ইউনিয়ন নামে যে সশস্ত্র সংগঠন রয়েছে, তার শক্তিশালী ঘাঁটি রয়েছে থাইল্যান্ড সীমান্তের কাছে। আগেই বলেছি, বাংলাদেশ সীমান্তে গোলা পড়ছে আরাকান আর্মির সঙ্গে সংঘাতের কারণে। অভিযানের কারণে আরাকান আর্মির সদস্যদের বাংলাদেশ সীমান্তের কাছাকাছি চলে আসা বা কখনও সীমান্ত পাড়ি দেওয়া অমূলক নয়।

মনে রাখতে হবে– মিয়ানমারের ভেতরকার অস্থিতিশীলতা নতুন নয়। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকেই যখন বার্মিজ ভাষা ও সংস্কৃতি সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় তখন থেকেই সংঘাত চলছে। কখনও সংঘর্ষ বাড়ে, কখনও কমে। যার প্রভাব শুধু মিয়ানমারের ভেতরেই সীমাবদ্ধ থাকে না। রাখাইনে বসবাসরত রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়ে আসছে বিভিন্ন সময়ে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর অত্যাচার-নিপীড়ন থেকে বাঁচতে। সর্বশেষ ২০১৭ সালে জাতিগত নিধন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে রোহিঙ্গাদের ওপর যে হত্যা, গণহত্যা, ধর্ষণ ও নিপীড়ন চালানো হয়; তার ফলে অন্তত সাত লাখ রোহিঙ্গা জীবন বাঁচাতে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়।

গত কয়েক বছরে রোহিঙ্গা ইস্যুতে মিয়ানমার আন্তর্জাতিকভাবে বেশ চাপের মুখে পড়লেও এখনও টিকে রয়েছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়েরই অপর অংশের আশীর্বাদে। মিয়ানমারের ভেতরকার এসব সংঘাতের কারণে বাংলাদেশসহ প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো যেভাবে আক্রান্ত হচ্ছে এবং দেশটির ভেতরকার বিচ্ছিন্নতাবাদীদের যে কর্মকাণ্ড আমরা দেখছি; তাতে এ অঞ্চল অস্থিতিশীল হয়ে উঠতে পারে, যার প্রভাব আন্তর্জাতিক পর্যায়েও পড়তে বাধ্য। অথচ মিয়ানমারের ওপর আঞ্চলিক কিংবা আন্তর্জাতিক চাপ সেভাবে দেখা যাচ্ছে না। রাশিয়া, চীন কিংবা ভারত তাদের ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থের কারণে মিয়ানমারের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে নিচ্ছে না। আঞ্চলিক সংগঠন আসিয়ান কিংবা বিমসটেকের পক্ষ থেকেও সে ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে না। এমনকি মিয়ানমারের জান্তাপ্রধান ইস্টার্ন ইকোনমিক ফোরামের সম্মেলনে যোগ দিতে আগামী সপ্তাহে রাশিয়া সফরে যাচ্ছেন। চীন, ভারত, জাপানসহ বেশ কিছু দেশের প্রতিনিধিও ওই সম্মেলনে অংশ নেবেন। এর আগে জান্তাপ্রধান আসিয়ানের সম্মেলনেও যোগ দিয়েছিলেন।

এসব কারণেই দশকের পর দশক ধরে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর আচরণের কোনো পরিবর্তন হয়নি। বরং গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচিত সরকার হটিয়ে ক্ষমতা দখলের পর থেকে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত নাগরিকদের দমাতে তারা বর্বরোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। হাজারো মানুষ ইতোমধ্যে হতাহত হয়েছে। জেলে পোরা হয়েছে অগণিত নাগরিককে। এখন সামরিক জান্তা মিয়ানমারের অভ্যন্তরে বেপরোয়া হয়ে ওঠার পাশাপাশি প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও যে বাড়াবাড়ি করছে– বাংলাদেশের আকাশসীমা লঙ্ঘন এবং সীমান্তের অভ্যন্তরে গোলা ফেলা তারই প্রমাণ। এটা ঠিক, মিয়ানমারের উস্কানিতে পা দেওয়া যবে নাই। কিন্তু বাংলাদেশ এ বাপারে একেবারে নিশ্চুপ থাকলে পরিস্থিতির উন্নতি দূরে থাক, আরও অবনতি হতে পারে। মিয়ানমার ধর্মের কাহিনি শোনার পাত্র নয়।

■ ইশফাক ইলাহী চৌধুরী; নিরাপত্তা বিশ্লেষক ও অবসরপ্রাপ্ত এয়ার কমডোর; ট্রেজারার, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি